ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বৈশ্বিক জলবায়ু ধর্মঘট বাংলাদেশ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডসসহ বাংলাদেশের তরুণ সমাজের আহবান: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এজন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তন এই পৃথিবী তথা মানব সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট হিসাবে দেখা দিলেও তা মোকাবেলায় পর্যাপ্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সার্বিকভাবে বিশ্ব নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনকে স্বাভাবিক অবস্থা (business as usual) হিসেবে ধরে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলো তেল, কয়লা এবং গ্যাসভিত্তিক জ্বালানি ব্যবস্থার অনুকূল নীতি অব্যাহত রেখেছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীকে আরও বেশি উত্তপ্ত করে তুলছে। ফলে ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর হলেও তা বাস্তবায়নসহ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে পর্যাপ্ত গুরুত্বারোপ না করলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট আরও প্রকট হবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে অপূরণীয় ও অপরিবর্তনীয় (irreversible) ক্ষতি হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশর মতো সমুদ্র উপকূলীয় দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে। নাসার তথ্যমতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মোট ভূমির ১০% পানিতে তলিয়ে যাওয়াসহ উপকূলীয় এলাকায় বন্যা, নদী ভাঙন এবং কৃষিতে বিপর্যয়ের প্রভাবে ২.৭ কোটি মানুষের পরিবেশ শরণার্থী হওয়ার আশংকা রয়েছে।

প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে শিল্পোন্নত জি-২০ ভুক্ত সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী ছয়টি দেশ কাঙ্খিত হারে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ ১০০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৫০ সালের মধ্যে জিরো-কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে তার মোট বিদ্যুতের চাহিদার ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য খাত থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া সরকার সম্প্রতি কাপ্তাই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান বাঁধ এলাকায় ৭.৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্ল্যান্ট উদ্বোধন করার পাশাপাশি মোট ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র ২.৯৯ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদন করছে। তবে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে অফ-গ্রিড এলাকায় সোলার হোমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং প্রসার বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সাফল্য, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত থেকে সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ থাকায় টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্প্রতি বিদ্যুৎ বিভাগের গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে বায়ু বিদ্যুৎ থেকে ২১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও তা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি। অন্যদিকে উপকূলের টাইডাল ওয়েভ ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশ এশিয়ার সর্বনিম্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ।

অন্যদিকে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ 'কাঙ্খিত জাতীয় নির্ধারিত অবদান' বা ইনটেন্ডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (আইএনডিসি)'এ ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও বন ও সংরক্ষিত এলাকায় রামপাল, মাতারবাড়ি, পায়রা, ট্যাংরাগিরির মতো বড় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রিনপিসের তথ্যমতে শুধু মাতারবাড়িতে ১৩০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালু হলে পরবর্তী ৩০ বছরে ঐ অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে ১৪ হাজার মানুষের অকালমৃত্যু হবে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ খাতে মহাপরিকল্পনার যে খসড়া করেছে সেখানে ২০৪১ সালের মধ্যে এ রকম কয়লাভিত্তিক মোট ২০টি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। শুধু কয়লা পুড়িয়েই এই সময়ের মধ্যে সরকার ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করা সহ অনুরূপ প্রকল্প গ্রহনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসছে তখন বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক জ্বালানির ব্যাপক বিস্তারের পরিকল্পনা শুধু অকালমৃত্যু সহ বহুমুখী স্বাস্থ্যঝুঁকির জন্য উদ্বেগজনকই নয়, একই সাথে পরিবেশের জন্য আত্মঘাতী এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নীতি-নির্ধারকরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করার সার্বিক প্রেক্ষিতে সুইডিস কিশোরী পরিবেশবাদী এবং অ্যাকটিভিস্ট গ্রেতা থর্নবার্গ ২০১৮ সালের জলবায়ু সম্মেলনে এককভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন। এরই ধারাহিকতায় তিনি ২০ আগস্ট ২০১৮ থেকে সুইডেনের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের দিন ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত স্কুলে না গিয়ে সুইডিস পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন যা বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলে। তার অনুপ্রেরণায় এর পরপরই দেশে দেশে স্কুল শিক্ষার্থীরা একই ধরনের বিক্ষোভে সামিল হয়। সেই প্রতিবাদকে কিশোর কিশোরীদের মাঝে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে এ বছর জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক জরুরি সম্মেলনকে সামনে রেখে ২০ ও ২৭ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ১২০টি দেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিশ্বব্যাপী ধর্মঘট, গণ প্রতিবাদ ও র‍্যালির আয়োজন করছে, যা বৈশ্বিক জলবায়ু ধর্মঘট বা 'গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইক' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের সাথে মিল রেখে রাজনীতিবিদদের পদক্ষেপ গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করা, সকলে একত্রে কাজ করা, ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিশ্বের প্রধান শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বন্ধ করে ২০ ও ২৭ সেপ্টেম্বর শ্রেণিকক্ষের বাইরে বেরিয়ে আসবে। তরুণ শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সম্পৃক্ত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্মীরাও তাদের অফিস ও কাজ বন্ধ রেখে এই গণ প্রতিবাদ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করছেন। এই প্রতিবাদ ও র‍্যালির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত নীতি-নির্ধারকদের দেখানো যে, যারা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে শুধু তারাই নয় বরং সারা বিশ্বের ঝুঁকিতে থাকা লাখ লাখ মানুষ এই দাবির সাথে একাত্ম।

এ পেক্ষাপটে শিল্পোন্নত দেশের প্রতিশ্রুতি রক্ষার আহবান সহ বৈশ্বিক জলবায়ু ধর্মঘট বা গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইকের সাথে সংহতি প্রকাশ করে টিআইবি ও বিশেষ করে টিআইবির উদ্যোগে অনুপ্রাণিত দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের মূল স্তম্ভ সনাক ও স্বজন এবং এর চালিকাশক্তি তরুণ ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যগণ ও তাদের আহবানে সারাদেশের তরুণ প্রজন্ম নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট দাবিসমূহ উপস্থাপন করছে:

১. **বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সীমিত করা:** বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার লক্ষ্যে
   - কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে শিল্পোন্নত দেশসমূহকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে হবে;
   - শিল্পোন্নত দেশগুলোতে তেল, কয়লা এবং গ্যাসভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট পর্যায়ক্রমে দ্রুততার সাথে বন্ধ করতে হবে;
   - উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নতুন কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশকেও এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওপর সরকারের চলমান প্রাধান্যের অবসান করে অনতিবিলম্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর প্রকল্পে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে;
   - নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অর্থায়নসহ কার্যকর পদক্ষেপ যেমন, ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

২. **দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু অর্থায়ন:** শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রস্তাবিত ১০০ বিলিয়ন ডলার রূপরেখায় অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে পর্যাপ্ত জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিতের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে;

৩. **উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত 'নতুন' এবং 'অতিরিক্ত' জলবায়ু তহবিল:** বিশ্বব্যাপী অভিযোজনের জন্য ২০২৫ সাল নাগাদ প্রতি বছরে কমপক্ষে ১৫০ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন। 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান' নীতি মান্য করে ঋণ নয়, ক্ষতিপূরন হিসেবে সরকারি অনুদান প্রদান করতে হবে। একইসাথে উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রতিশ্রুতিকে স্বীকৃতি দিয়ে তদনুযায়ী বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

৪. **জলবায়ু অর্থায়নে ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা:** জলবায়ু অর্থায়নে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিসহ আন্তর্জাতিক অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের চাপ বা কৌশল উপেক্ষা করে বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনুদান সংগ্রহে সরকারকে আরো সক্রিয় হতে হবে। জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন, কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতে সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এবং অভিযোজন তহবিল থেকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

৫. **প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণমূলক কর্মকৌশল:** প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, নাগরিক সমাজ ও বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬(নতুন) ২৭(পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২; ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org; ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org